# সাহিত্য

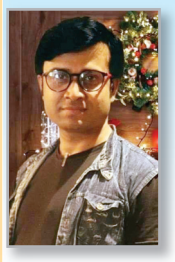

অনেকে মনে করেন, যে-কোনও গল্পের নাট্যরূপকেই সিনেমার ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য বলা হয়, যা আদৌ সত্য নয়। আধুনিক চিত্রনাট্যের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ নিয়ে লিখছেন **মুহাম্মদ আবদুল আলিম**

## সিনেমার চিত্রনাট্য: ইতিহাস ও বিবর্তন

সাধারণত 'চিত্রনাট্য' সিনেমার জন্য লিখিত নাট্যরূপকে বলা হয়। স্ক্রিপ্ট, সিনারিও ইত্যাদি সংজ্ঞাতেও সংজ্ঞায়িত করা হয়। বাংলায় বলা হয় চিত্রনাট্য। সিনেমায় এই চিত্রনাট্য লেখার জন্য কিছু পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়, যেগুলো সাধারণ নাটকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মঞ্চে অভিনয় করার জন্য যে-নাটক লেখা হয় তাতে বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে সংলাপের সঙ্গে আনুসঙ্গিক সেটের কিছু বর্ণনা থাকে, যেখানে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে বা অভিনয় করা হবে। যেমন মঞ্চের পারিপার্শ্বিক বস্তু ইত্যাদি। কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে লিখিত চিত্রনাট্যে চরিত্রের সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক অনেক কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা থাকে যেমন— স্থান, কালগত অবস্থান, ক্যামেরার মুভমেন্ট, চরিত্রের চলাফেরার খণ্ড ইঙ্গিত, দেহভঙ্গিমা ইত্যাদি।

বিভিন্ন চিত্রনাট্যকার বিভিন্নভাবে চিত্রনাট্য রচনা করে থাকেন। কোনও চিত্রনাট্যকার দৃশ্যের বিভাজন করে শুধুমাত্র সংলাপ লিপিবদ্ধ করেন, বাকি শট ডিভিশন শুটিং পর্বের আগে পরিচালক স্কেচ করে নেন। আবার অনেক চিত্রনাট্যকার সংলাপের পাশাপাশি ক্যামেরার মুভমেন্ট, দৃশ্যের কৌণিক অবস্থান, শট ডিভিশন অর্থাৎ চরিত্রের কতটুকু শরীরী অংশ ফ্রেমের মধ্যে থাকবে— তাও লিপিবদ্ধ করেন। এইসব কাজ মূলত চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক যদি একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন তখন করে থাকেন। চিত্রনাট্যকার আর পরিচালক আলাদা ব্যক্তি হলে সাধারণত এইসব শট ডিভিজন ও ক্যামেরার মুভমেন্ট লিপিবদ্ধ করেন না, কারণ যে-দৃশ্যকল্প চিন্তা করে চিত্রনাট্যকার এসব করে থাকেন— তা অনেক সময় লোকেশনে গিয়ে সেই দৃশ্য শুট করা পরিচালকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

পরিচালক যদি নিজের ছবির চিত্রনাট্য নিজেই লেখেন, তাহলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে প্রত্যক্ষ হয়। কারণ পরিচালক নিজের কল্পনায় যে, সিকোয়েন্সটিকে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন, অন্য চিত্রনাট্যকারের রচনা অবলম্বন করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করলে সেই অনুযায়ী দৃশ্যের কম্পোজিশনটা গড়ে ওঠে না। সেজন্যই দেখা যায়, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক যদি আলাদা ব্যক্তি হন তখন পরিচালক শুটিং করতে গিয়ে মূল চিত্রনাট্যের অনেক কিছুই পরিবর্তন করে থাকেন। অনেক সময় চিত্রনাট্যকারের লেখা সংলাপ ঠিকঠাক খাপ না খেলে মূল বক্তব্যের কোনওরকম পরিবর্তন না করে অভিনেতা বা অভিনেত্রীরাও নিজেদের মতো করে সংলাপ বলে যান।

চিত্রনাট্য লেখার কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। আগে যেভাবে চিত্রনাট্য লেখা হত সেভাবে এখন লেখা হয় না। আধুনিক চিত্রনাট্য রচনার রীতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিখ্যাত রুশ চিত্র পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন চিত্রনাট্য লেখার কতকগুলো নিয়মের কথা বলেছিলেন— যাকে অবলম্বন করে চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব ব্যাকরণ গড়ে ওঠে।

সত্যজিৎ রায় ও পূর্ণেন্দু পত্রী-সহ অনেক পরিচালক আছেন যাঁরা ছোট ছোট স্কেচের মাধ্যমে আগে থেকেই পুরো দৃশ্যকে মনে মনে কল্পনা করে রাখতেন। এই রীতি চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর বলেও অনেক পরিচালক মনে করে থাকেন। আধুনিক অনেক চিত্র পরিচালক রয়েছেন যাঁরা চিত্রনাট্য সম্পর্কে কোনওরূপ পূর্বলিখিত বা পূর্বপরিকল্পিত কোনও নির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করে চলেন না। অর্থাৎ শুটিং-এর সময়েই কি করবেন— তা ঠিক করে নেন। এমনকি অনেকে এমন রয়েছেন যাঁরা নির্দিষ্ট সংলাপ লিখে রাখারও পক্ষপাতী নন। এটা সাধারণত হলিউডেই বেশি হয়।

সত্যজিৎ রায় চিত্রনাট্য সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি চিত্রনাট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে গদার এর কথা বলব না, কারণ এসব পরিচালককে কোনও নিয়মের গণ্ডির মধ্যে ফেলা যায় না। যারা চিত্রনাট্যের বিষয়ে জানতে চান, তারা যদি এইসব পরিচালক দ্বারা শুরু করেন, তাহলে খুব বেশি লাভজনক হবে বলে আমি মনে করি না। বিশেষত গদরের প্রায় ছবি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তার একটা লক্ষ্য হল সিনেমার সনাতন রীতিগুলোকে অত্যন্ত সচেতনভাবে ভেঙে ফেলা। কাজেই, গদারকে বোঝার আগে জানা চাই— এই সনাতন রীতিগুলোকে চিত্রনাট্যকারের কোনও সমস্যার সঙ্গে সাহিত্যিকের সমস্যার বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। দু'জনের কাজ হলে কোনও একটি বিষয়বস্তুকে ভাষায় ব্যক্ত করা। তফাৎ এই যে, সাহিত্যিক কেবল মাত্র কথার আশ্রয় নেন; চিত্রনাট্যকার কিছুটা কথা এবং কিছুটা ছবি ও ধ্বনির মধ্যে দিয়ে তাঁর কথা বলেন।'

সত্যজিৎ রায় 'চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে সাহিত্য আর চিত্রনাট্যের মধ্যে মূল পার্থক্য সম্পর্কে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাতে তিনি চিত্রনাট্যে সংলাপের ব্যবহার প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'চলচ্চিত্রে সংলাপের প্রধানত দু'টি কাজ। এক. কাহিনিকে ব্যক্ত করা; দুই. পাত্রপাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করা। সাহিত্যের কাহিনিতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সেই কাজ হয়। সংলাপ যদি স্বাভাবিক না হয়, তাহলে অভিনয় স্বাভাবিক হওয়া মুশকিল। বাস্তব জীবনে মানুষ একই বক্তব্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করে। একই কথা অলস-মুহূর্তে একভাবে, কর্মরত অবস্থায় আরেকভাবে; এমনকি গ্রীষ্মে ঘর্মাক্ত অবস্থায় একভাবে এবং শীতে কম্পমান অবস্থায় আরেকভাবে ব্যক্ত হয়। নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় মানুষের কথার লয় হয় বিলম্বিত, উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের কথা কেটে যায়, বাক্য উখিত হয় নিশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে।'

সত্যজিৎ রায় অস্কার জয়ী 'পথের পাঁচালী' সিনেমার পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য একেবারেই তৈরি করেননি। পাণ্ডুলিপির একতাড়া কাগজে লেখা ছিল কিছু নোট আর কিছু স্কেচ। তাঁর আঁকা ছবি ও টিকাগুলি থেকে এই চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। তিনি ১৯৫০ সালে লন্ডনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করেন, সেই সময় এই নোটগুলি লেখেন।

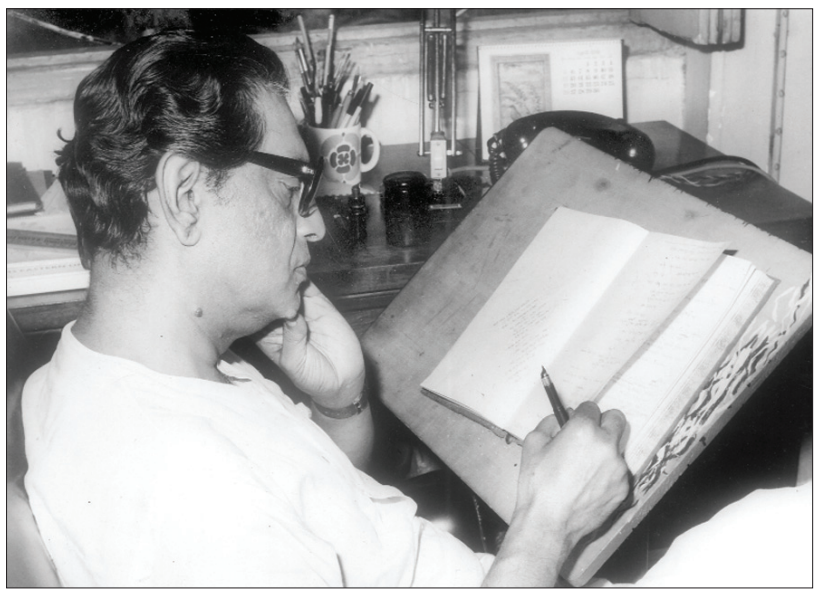

*কিংবদন্তি দুই চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন ।*

ছবিতে কাহিনি বোঝবার জন্য পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যের প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। তিনি বলেন, 'একে তো পুরো কাহিনিটাই আমার মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল, তার উপরে আবার ডি.কে-র করা সারাংশ আর চিত্রনাট্যের মূল উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল কম নয়। ছবির কাহিনি থেকে মূল বইয়ের প্রচুর চরিত্র বাদ দেওয়া হয়। পুরুতঠাকুর হরিহর রায় ও তাঁর পরিবার, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী সর্বজয়া, মেয়ে দুর্গা, ছেলে অপু, আর বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক দূর সম্পর্কের দিদি ইন্দির ঠাকরুণ, হরিহরের ছেলেমেয়েরা যাকে পিসি বলে ডাকে— ব্যাস, মূলত এই ক'টি চরিত্রকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে ছবির কাহিনি। ছবির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলে মূল বইয়ের একটানা অনেক বাগিবস্তার বর্জন করে ঘটনাগুলিকে আমি একটু অন্যভাবে সাজিয়ে নিই, ফলে ছবির কাহিনিতে একটা নতুন বুনট তৈরি হয়ে ওঠে। পিসিটিকে যে, আমি আরও অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখি। তার কারণ আমি জানতাম, নানা রকমের নাটকীয় ঘটনায় ভরা ওই পরিবেশ থেকে যদি হঠাৎ তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয় তো দর্শকদের পক্ষে সেটা একটা নৈরাশ্যজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। মূল বইয়ে অপুর জন্মের কিছুদিন বাদেই তিনি মারা যান। সেক্ষেত্রে ছবিতে তিনি যখন মারা যান, দুর্গার বয়স তখন দশ-এগারো। একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে অপু আর দুর্গা তাঁর মৃতদেহ দেখতে যায়। মৃত্যু যে কী, তা তারা সেই প্রথম জানল।'

দুর্গার মৃত্যু নিয়ে সত্যজিৎ রায় যা কিছু তাঁর সিনেমায় দেখিয়েছেন— তা বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের মূল 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে নেই। সেখানে তিনি গল্পের কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গা নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয় এবং তার মৃত্যু হয়, অথচ মূল বইয়ে এমনটা নেই।

অপুর পাঁচালী বইয়ের মধ্যে সত্যজিৎ রায় লিখেছেন যে,চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে তিনি উপন্যাসের অনেক চরিত্রকে সরিয়ে দিয়েছিলেন ও গল্পের মধ্যেও বেশ কিছুটা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলেন। উপন্যাসের শুরুর দিকেই গ্রামের মন্দিরে সামনেই ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু সিনেমায় দেখা যায় অপু ও দুর্গা তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। চলচ্চিত্রের অপু ও দুর্গার ট্রেন দেখার জন্য দৌড়নোর যে-দৃশ্য— সেটিও মূল উপন্যাসে নেই। বর্ষায় ভিজে প্রচণ্ড জ্বর বাঁধিয়ে দুর্গার মৃত্যু ঘটে বলে চলচ্চিত্রে দেখানো হলেও উপন্যাসে মৃত্যুর কারণ অজানাই রাখা হয়েছে। হরিহর রায়ের পরিবারের গ্রাম ত্যাগ দিয়ে চলচ্চিত্র শেষ হলেও উপন্যাস সেই ভাবে শেষ হয়নি।

এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'জঙ্গলের ঝড়-বাদলের মধ্যে তার ওই আত্মহারা নাচ, দুর্গার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে এটাকেই আমি তুলে ধরি। দুর্গার মৃত্যুর পরে আমার কাহিনিতে ধীরে ধীরে উপসংহার টানি এবং দেখাই পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে হরিহর তাঁর পরিবার নিয়ে কাশীতে চলে যাচ্ছেন।' (চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে)।

আন্তনিওনি বলেছেন, I go away by myself for half an hour or so before we begin shooting. আবার ব্রেসর কথা : I arrive in the morning knowing what I intend to do during the day, but not how I intend do it. অন্যদিকে গদার বলেছেন : I have an idea at the back of my mind, and I develop it with my actors, although we work from a written text, the dialogue may only be put down on paper a few minutes before we start filming.

চিত্রনাট্যের এই ক্রমবিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে অনেকে অনুমান করেন, সুদূর ভবিষ্যতে সিনেমার প্রয়োজনে লিখিত কোনও চিত্রনাট্য ধরনের বস্তু আদৌ থাকবে কি-না সন্দেহ।

জন্মলগ্ন থেকে চলচ্চিত্রের 'চিত্রনাট্য' ব্যাপারটির মধ্যে এক অভিনব ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে অনেক এমন চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক রয়েছেন যাঁরা চিত্রনাট্যের এই বিবর্তনটিকে ভেঙে দিচ্ছেন। অনেকে চিত্রনাট্যকে 'চলচ্চিত্রনাট্য' নামে অবিহিত করছেন, তবে আমার মনে হয় 'চিত্রনাট্য' নামটাই অধিক সঙ্গত।

শুরুর দিকে সিনেমার চিত্রনাট্য ছিল অনেকটা সাহিত্য-নির্ভর। সাহিত্যের গল্পকে কেন্দ্র করে চিত্রনাট্য লেখা হত। ক্রমবিবর্তনে যখন সিনেমা স্বতন্ত্র একটা ইন্ডাস্ট্রি রূপে স্বীকৃত হল তার পর থেকে গল্পের নাট্যরূপকে 'চিত্রনাট্য' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হতে লাগল। চলচ্চিত্রের বিবর্তনের ফলে চিত্রনাট্যের মধ্যেও এক অভিনব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ফলে এখন আমরা এমন একটা যুগে পদার্পণ করেছি যেখানে চিত্রনাট্যকে অনেকে স্বতন্ত্র সাহিত্য রূপে স্বীকৃত দিচ্ছেন। স্বীকৃত না দিয়েও উপায় নেই— কারণ সাম্প্রতিককালে বহু চিত্রনাট্য আদালাদাভাবে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যেগুলোর শিল্পমূল্য অস্বীকার করা যায় না। যেমন— সত্যজিৎ রায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মৃণাল সেন প্রমুখ পরিচালকদের লেখা চিত্রনাট্য ব্যাপক পরিমাণে বিক্রি হয়। যদিও এইসব চিত্রনাট্য তখনই প্রকাশিত হয়েছে যখন এগুলি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির আগে কোনও চিত্রনাট্য গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে ভবিষ্যতে চিত্রনাট্য শুটিং হওয়ার আগে প্রকাশিত হবে কি-না— সেটা সময়ই বলবে।

সিনেমার প্রাথমিক এবং শক্তিশালী উপকরণ হল ক্যামেরা। সেজন্য ক্যামেরার গতিবিধি বা মুভমেন্ট চিত্রনাট্যে উল্লেখ করে দেওয়া হয়। সিনেমার পরিভাষায় একে 'ট্রিটমেন্ট' বলা হয়। চরিত্রের গতিবিধিকেও 'ট্রিটমেন্ট' বলে অবিহিত করা হয়।

উপন্যাসের মতো চিত্রনাট্যে কোনও ঘটনাক্রমকে অনন্তকাল ধরে বর্ণনা করা হয় না। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে বিভাজন করে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। সেগুলিকে শুট করার পর সম্পাদনার মাধ্যমে একটা অখণ্ড চলচ্চিত্রের রূপ দেওয়া হয়। এইসব খণ্ড খণ্ড দৃশ্য সম্পাদনার মাধ্যমে এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয় তাতে দর্শক গল্পের ধারাবাহিকতা বুঝতে পারেন। যাঁরা চিত্রনাট্য পড়তে অভ্যস্ত, তাঁরা সহজেই একটা সিনেমাটা না দেখেও গল্পের দৃশ্যক্রম কল্পনা করতে সক্ষম হন। তাঁরা কল্পনা করে মনের মধ্যে যে দৃশ্যগঠন করেন— তা হয়তো মূল উক্ত সিনেমার দৃশ্যগঠনের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। তবে মূল চিত্রনাট্যের কাছাকাছি একটা দৃশ্য গঠনে সক্ষম হবেন।

একটি সফল চিত্রনাট্যের মধ্যে লেখকের কল্পনা এবং বাস্তবতা দু'টোই থাকতে হবে। কাল্পনিক কোনও কাহিনিকে অবলম্বন করে চিত্রনাট্য নিখলেও অবান্তর কোনও কিছু লেখা যাবে না। চিত্রনাট্যকারকে অবশ্যই খেলায় রাখতে হবে যে, স্থানকালের অবস্থা কী রকম, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, চরিত্রের গতিবিধি, কাহিনির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, সর্বশেষ চলচ্চিত্রের নিয়ম বা ধর্ম অনুযায়ী বিবিধ উপকরণের সূক্ষ্ম নির্বাচন। এছাড়াও বাস্তবতা যাতে রক্ষা পায়— সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। না নাহলে চিত্রনাট্য দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রকেও দুর্বল করে দেয়। এখানে অতিরঞ্জিত বর্ণনার কোনও স্থান নেই। মনে রাখতে হবে, ক্যামেরা-ই হল চিত্রনাট্যের ভাষা। তাই ক্যামেরায় কতটুকু ধরা পড়বে— সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে, ক্যামেরায় ধরা পড়বে না— এমন কিছু বর্ণনা করার সুযোগ চিত্রনাট্যে নেই।

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যেমন বাক্য গঠনে পূর্ণচ্ছেদ,বিরামচিহ্ন ইত্যাদি ব্যাকরণের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে অনুরূপ চিত্রনাট্যেও কাট, জাম্প কাট, ইন্টার কাট, মিক্স বা ভিজলভ, ফেড-আউট, ফেড-ইন ইত্যাদি এই জাতীয় ব্যাপার আছে যেগুলি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। ফলে চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের গঠনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়।

## শরীয়তুল্লাহ

**আবদুল হাই শিকদার**

শরীয়তুল্লাহ শরীয়তুল্লাহ
শক্ত মাটিতে রাখো কদম,
কারা ডাক দেয় এভাবে আমাকে
ঘুম ভেঙে যায় নেন না দম।

আল আজহার পিছু পড়ে থাকে,
তত্ত্বের ত্যানা ফেলে পথবাঁকে,
শুনলেন তিনি বুক পেতে পেতে
মানুষের আহাজারি,
শুভ্রতা মাখা হাত দুটি তার
হয়ে ওঠে যেন খোলা তলোয়ার,
সকল আয়েশ খান খান করে
ছাড়লেন ঘরবাড়ি।

শরীয়তুল্লাহ শরীয়তুল্লাহ
আড়িয়াল খাঁর বুক ফাটা ডাক,
ঘুম ভেঙে যায় পথে নেমে
দেখে
মানুষে মানুষে যোজন ফাঁক।

শরীয়তুল্লাহ শরীয়তুল্লাহ
পদ্মাবক্ষে মহাতুফান,
শরীয়তুল্লাহ চোখ ভিজে যায়
কিভাবে বাঁচাবে নিযুত প্রাণ।

শরীয়তুল্লাহ নামলেন পথে
মাথার ওপরে ক্রুদ্ধ মেঘ,
পায়ের নিচের জলাভূমিগুলো
দুপায়ে জড়ায় কি উদ্বেগ।

তবু ফিরলেন মানুষের দিকে
কিতাবটিতাব তাকে তুলে,
নামলেন তিনি মানবভূগোলে
'মানবসত্য' বই খুলে।

ঝড়ের রাতের মহামাস্তুল
চললেন শত ভ্রুকুটি ঠেলে
মানুষ মরেছে হয়েছে জন্তু
প্রভু দেখো শুধু চোখটা মেলে।

কি করে আরশে বুঁদ হয়ে আছো
ভয়ানক তুমি নির্বিকার,
সাদা শকুনের লালসার লালা
কর তুমি তার ঠিক বিচার।

চললেন তিনি দৃঢ় ধীর পায়ে
আজানে আজানে জাগে মানুষ ,
তারাও দাঁড়ালো অপমান ঝেড়ে
যারা ছিলো নিচে পুরো বেহুঁশ।

রাত ভোর হয় কাটে সংশয়,
শরীয়তুল্লাহ স্বপ্নবান,
এতো প্রেম তুমি কোথায়
পেয়েছো
ফরাজি যুদ্ধ বিশ্ব প্রাণ।

শরীয়তুল্লাহ শরীয়তুল্লাহ
এই নাম নিতে কত যে সুখ,
আকাশে আকাশে কত যে
কোরাস
মুক্তা ফলালো কত ঝিনুক।

এই ব-দ্বীপে হৃদয় প্রদীপে
তুমি হয়ে আছো ধানের শীষ,
গাছ ফুল পাখি নদী ও মানুষ
তোমাকে পাঠায় শত আশীষ।

শরীয়তুল্লাহ শরীয়তুল্লাহ
মহাজন তুমি কোন খোদার ?
কি করে পারলে বিমুখ আরশে
আমাদের ব্যথা পেশ করার!

শরীয়তুল্লাহ শরীয়তুল্লাহ
কোন রমণীর জান ছিলে?
মানুষের তুমি, তুমিই মানুষ
তাই জেগে আছো দেশ-দীলে।

## জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে জাতীয়তা প্রসঙ্গ

**আমিনুল ইসলাম**

*পূর্ব প্রকাশিতের পর—*

(৩)

'সরোজিনী নাটক সম্বন্ধে উপসংহারে এ-মন্তব্য করা চলে যে, আদর্শ প্রচার একান্তভাবে প্রকট না হলেও এবং চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার শেষরক্ষা করতে পারেননি। এখানে স্বজাতীয় আদর্শ প্রচার অপেক্ষা বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেকই মুখ্য ভাবরূপ পেয়েছে। এই অপপ্রচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে 'পুরুবিক্রম' অপেক্ষা 'সরোজিনী' নাটক অপকৃষ্ট সৃষ্টি। 'পুরুবিক্রম'-এর যবন মুসলমান নয়, গ্রীকদেশবাসী। সুতরাং, পুরুরাজের কাহিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু সরোজিনী নাটক প্রকাশ্যে ইসলাম-বিদ্বেষ প্রচার করল। পরধর্ম অসহিষ্ণুতা সভ্যরুচি বিগর্হিত। এখানেই পুনরুক্তি করে বলা যায় যে, প্রচারধর্মী সৃষ্টি অতিরঞ্জন ও একদেশদর্শী হয়। এই উভয়বিধ দোষত্রুটি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। এখানে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পরাভূত হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

'সরোজিনী' নাটকের মতো 'অশ্রুমতী' নাটকেও জেমস টড-এর 'রাজস্থান' থেকে কাহিনি গৃহীত হয়েছে। নাটকের সূচনায় নাট্যকার তার নাটকীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন : 'There is not a pass in the Alpine Aravalli that is not Sanctified by some deed of Protap, some brilliant victory or often more glorious defeat. Haldighat is the Thermopoylee of Mewar, the field of Dewer her Marathan.'

অতীত ভারতের গৌরবময় বীরত্বগাথাকেই তিনি সেকালের ভারতবাসীর অন্তরে স্বাধীনতা লাভের কামনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত করেন। বীর প্রতাপ সিংহের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ যাতে প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে দেশের জন্য আত্মানুভূতির বাসনা জাগরিত করে, তাই ছিল নাট্যকারের ঐকান্তিক কামনা।

এই যে দেশাত্ববাধের নবজাগরণ— এটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর পক্ষে প্রযাজ্যে হল না। স্পষ্টত বলতে গেলে, এ-জাগরণকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বলা চলে। কারণ 'হিন্দুমেলা'র প্রকৃত উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্ববাধে প্রচার হলেও হিন্দুধর্মের শৌর্যবীর্যের পুনরুত্থানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুর মনে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রেম জাগিয়ে তোলার আশায় হিন্দু-মুসলিম সংগ্রামের ইতিহাসকে বিষয়বস্তু স্বরূপ গ্রহণ করা হল। ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক দেশবাসীর মনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবাধে জাগিয়ে তোলা দূরে থাকুক, আত্মবিদ্বেষ ঘনীভূত হয়ে এল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ' ইত্যাদির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলোও একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হল। প্রতিক্রিয়া যে হয়নি— তা নয়, মুহাম্মদ ইদ্রিশ আলির 'বঙ্কিমদুহিতা' (১৯১৭)ও সেদিনের শিক্ষিত মুসলমানের কাছ থেকে জবাবস্বরূপ পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার করে ভারতকে খণ্ড-ছিন্ন করবার মতো হীন অথবা দীন অন্তরের অধিকারী তাঁরা ছিলেন না এবং হিন্দুজাগৃতি সেদিন ভারতীয় জাগৃতি অর্থেই তারা ব্যবহার করেছিলেন। তবুও হিন্দু-মুসলিম সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত করে মুসলিমকে হেয় প্রতিপন্ন করায় তাদের শিল্পীসত্তা যে অবমানিত হয়েছিল, সেই বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রকাশ্যে ইংরেজ রাজ-সরকারকে বিরুদ্ধ পক্ষে নির্বাচন করে দেশপ্রেম প্রচারের মতো মনোবল বা হৃদয়বল সেদিনের অধিকাংশ বাঙালিরই ছিল না বলেই তারা যবনকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই হৃদয় দৌর্বল্যের মূল্যও তাদের দিতে হল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তা পূর্ণ সার্থকতার গৌরব লাভে বঞ্চিত হল।

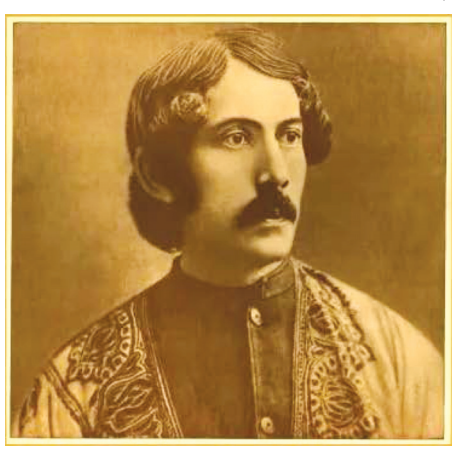

'অশ্রুমতী' নাটকে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারিত হয়েছে। অশ্রুমতীর শিক্ষা দান সম্পর্কে প্রতাপ বলেছেন : মহিষি, তুমি ওদের ভাল করে শিখিও যেসব গাথাতে রাজপুত বীরত্বের গুণকীর্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেইসব গাথা ওর কণ্ঠস্থ করিয়ে দিও।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠিক মুসলিম-বিরোধী ছিলেন না। 'অশ্রুমতী' নাটকে পাই, মুঘল রাজপুত্র সেলিমের সঙ্গে রাণা প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতীর প্রেমের কাহিনি। অশ্রুমতী বলে, আমি রাজপুত জানিনে, মুসলমানও জানিনে— আমার হৃদয় যাকে চায়, তাকেই জানি। এমন বক্তব্য নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুরা সেই সময়ে ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বহু আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, প্রতাপের মুখে পূর্বোক্ত সংলাপ যাজেনায় প্রতাপ-চরিত্রকে তার মহান গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রসঙ্গ ক্রমে ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন : ''শরৎ ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পর 'বেঙ্গল থিয়েটারে' তাহার সম্মান-রজনী উপলক্ষে 'অশ্রুমতী' নাটক অভিনীত হয় এবং অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র প্রতাপ সিংহের ভূমিকায় নামেন। দুই-এক অঙ্ক পরে তিনি চলিয়া যান। কিন্তু হঠাৎ এইরূপ চলিয়া যাওয়ার কারণ কেহ নির্ধারণ করিতে পারে না। কয়েকজন খুঁজিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে বলিলেন : আগে যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম যে, প্রতাপ সিংহের কন্যা সেলিমের অনুরাগিণী তবে কি এ অভিনয়ে সম্মতি দিই?''

এর থেকে আমরা এ-সত্যে উপনীত হই যে, 'অশ্রুমতী' নাটকের কাহিনি পরিকল্পনা হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের ভাবানুভূতিকেও আঘাত করেছিল। ঐতিহাসিক নাট্যকারের দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট থাকা প্রয়াজেন, কারণ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখা যেমন কর্তব্য, তেমনি ঐতিহাসিক সত্যজড়িত গণ-অনুভূতিকে লঙ্ঘন করে তাদের অন্তরে আঘাত করার অধিকার নাট্যকারের নেই। সুতরাং 'অশ্রুমতী'র অবাস্তব আদর্শচ্যুত চরিত্র পরিকল্পনা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই জাতীয়তা ও ধর্মীয় বাধেকে রুগ্ন করেছে। প্রতাপের মুখ থেকে নাট্যকার দেশপ্রেম প্রচার করেছেন— কি মানসিংহ তুমি, তুমি আমার অহঙ্কার চূর্ণ করবে! সর্বলোক পূজনীয় রামচন্দ্রের অকলঙ্কিত রক্ত যে ধমনীতে বহমান তার অহঙ্কার চূর্ণ করা কি দাসব্রতে রত পতিত মানভ্রষ্ট মানসিংহের কর্ম।

অন্যত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ঝালাপাতি মান্নাকে বলেছেন : না ঝালা, ছত্র উদ্যত থাক আমি চাই যে, এই চিহ্ন দেখে মানসিংহ আমার কাছে আসে যদি সে কাপুরুষ না হয়, অবশ্যই আসবে, চল, চল যেখানে মানসিংহ সেখানে চল।

এখানে প্রতাপচরিত্রে সমগ্র রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্য আরাপে করে নাট্যকার শিল্পরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকের দ্বিতীয় চরিত্রে সেলিম আদর্শ পুরুষ। সেলিম চরিত্রের ঔদার্য, মহত্ত্ব, বীরত্ব প্রভৃতি গুণ দেখে একথাও বলা যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হৃদয় সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ছিল। নায়িকা অশ্রুমতী বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিকারূপে চিত্রিত হয়েছেন। হয়তো রাজপুত রমণীরা কিছুটা কঠোর, কঠিন এবং সহজ-স্বচ্ছন্দ স্বভাবের অধিকারিণী ছিলেন, তবুও ভারতীয় নারীর রমণীয় কমনীয়তা ও লজ্জাশীলতা অশ্রুমতীকে স্পর্শ করতে পারেনি। অশ্রুমতী চরিত্র সৃষ্টিও তাই সামঞ্জস্য রক্ষা করে সার্থকতা লাভে অক্ষম হয়েছে।

'অশ্রুমতী' নাটক রচনার পর বহুদিন পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর কোনও প্রচারধর্মী